রাজবন্দীর জবানবন্দি

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট; আরধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী, রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে – সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য – জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন – ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে আইন বিশ্ব-মানবের সত্য-উপলব্ধি হতে সৃষ্ট; সে আইন সর্বজনীন সত্যের, সে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে – পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি; আমার পক্ষে – আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে – রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্‌বুদ্, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন – চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্ট অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহংকারের আর অন্ত নাই; সে

যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দি করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহংকার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্যপ্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে-যন্ত্র যিনি বাজান, সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে-বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মরব, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনই অভিযোগ-আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি – তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনই করে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনই যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বাণীরও নয়; দোষ তাঁর – যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বাণী বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমিও নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বাণী-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দি করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তাঁর প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তাঁর সত্যকে অনুবাদ করতে পারেনি। তার অনুবাদে রাজানুগত্য ফুটে উঠেছে, কেননা, তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণঙ কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল! আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি – আজ এই আদালতে আসামির কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনই নীরবে তাঁর রাজবন্দি সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারে না। এমনই বিচার প্রহসন করে যেদিন খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিনও ভগবান এমনই নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি

অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার এই বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য। তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন – এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? – রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না, এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো – এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না – এ আমার কণ্ঠে ওই উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ওই প্রলয়-হুংকার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না! হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনই বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ-অপরাধে ধৃত হয়ে এই

বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে সেই সময় এই বিচারক আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমি তো তাই এবং তেমনি করেই বলছি!

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী! তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, – কাহারও তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারও পিছনে পোঁ ধরি নাই, – আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই – সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, – তার জন্য ঘরের-বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না, অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দির জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়তূর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশানপুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ-রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায়-উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন, প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি একবার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি! কারাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজও-না-আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে – অমৃতের পুত্র আমি, হাসি-গানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবে। চিরশিশু

প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন! আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-ক্রিয়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবে এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ! ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল ও অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে, পরাধীনা অনাথিনি জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্রঃ'। আমি জানি –
ওই অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে, তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা
৭ জানুয়ারি, ১৯২৩।
রবিবার – দুপুর

নবযুগ

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মধ্যযুগের মহা উদ্‌বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ওই শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দিদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ওই শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ওই শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ওই শোনো ইস্‌রাফিলের শিঙায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ওই যে ভীম রণ কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে! সাগ্নিক ঋষির ঋক্‌মন্ত্র আজ বাণীলাভ করিয়াছে অগ্নি-পাথারে অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ওই মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দা তীব্র বহ্নি-ঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তিজ্যোতি বিস্ফারিত। আজ নূতন করিয়া – মহা গগনতলে দাঁড়াইয়া ওই অনাদি অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া আছে, কোথায় সে-অনন্তমুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া আছে বন্ধন-জর্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশি। সে বাঁশির সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতি ধরিয়াছে – ‘পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি!’ এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরও অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান, – জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।

ভারত যেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কত শত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে – তাহার অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্মেরও মর্মস্থলে! কত গোলা, কত গুলি, কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে! পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা। গর্দানে তাহার নির্দয় খামখেয়ালি পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল শিলা। চক্ষে তাহার সাতপুরু করিয়া কাপড় বাঁধা। সেই যে গা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায়ে সপাং সপাং করিয়া জল্লাদের লৌহ-হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্মম অপমানে, সে যখন ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া গর্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কশাই-এর ভোঁতা ছোরা দিয়া কচলাইয়া কচলাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহার বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজামথিত রক্তের বিপুল ঝাপটা

তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল! সেই সন্তানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জলভরা চোখে দেখিল, পূর্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে, 'নবযুগ' । নয়ন দিয়া তাহার হুহু করিয়া অশ্রুর শত পাগল-ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া দুই ব্যগ্র বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, 'তুমি এসো'! নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, 'আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো।'

আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, 'মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই 'খোদার উপর খোদকারী' শক্তিকে দলিত করো। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করো!' 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নতশিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্তরাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভূলুণ্ঠিত রবাব আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনও বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।' এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহা কল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল 'আবিরাবির্ম এধি' ! আবির্ভাব হও! আবির্ভাব হও!! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তিকল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ-জাতি-সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যথিত, নিপীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধন বেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে – ওই দেখো – বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল, হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।

ওই শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী। ওই বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ওই শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, – আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্যাভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড়ো-ছোটো ভাই বলিয়া যেন করুণা-ধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনের যেন এতটুকু দীনতা

থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগবাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক!

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসংকোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁঝরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না! তোমার পুত্র-শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ওই দূর সাগর পার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীরপুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকে হয়তো তোমার বেশি করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সেদিন আর চোখের জল ফেলিয়ো না, মা! বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সেদিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো।

এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই বীর ভ্রাতৃগণের শব। ওই গোরস্থান – ওই শ্মশানভূমিতে – শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্রস্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ওই শহিদ ভাইদের মুখ মনে করো, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে করো, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না! ভুলিয়ো না! আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বোনে-বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

ধূমকেতু'র পথ

অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, 'ধূমকেতু'-র পথ কী? সে কী বলতে চায়? এর দিয়ে কোন্ মঙ্গল আসবে ইত্যাদি।

নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতু'র পথনির্দেশ করছি।

প্রথম সংখ্যায় ধূমকেতুতে 'সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠেনি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়তো নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না-পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন – আশা করি। পূর্ণ সৃষ্টিকে প্রকাশ করে দেখাবার শক্তি হয়তো ভগবানেরও নেই, কোনো স্রষ্টারই নেই। মানুষ অপ্রকাশকে আপন মনের পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেখে।

সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথি এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশির মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর এই বিদ্রোহ করতে হলে – সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, – আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!

বলতে হবে, – যে যায় যাক সে, আমার হয়নি লয়!

কথাটা শুনতে হয়তো একটু বড়ো রকমের হয়ে গেল। একটু সহজ করে বলবার চেষ্টা করি। আর এইটাই ধূমকেতুর সবচেয়ে বড়ো বলা।

আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশি বুঝবার ভান করে যেন কারুর শ্রদ্ধা না প্রশংসা পাওয়ার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধিরই মতো হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মতো হোক কিংবা ঋষি অরবিন্দেরই মতো হোক, আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যতটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধির বাণীর আহ্বানে, ঠিক ততটুকু মানব। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না। এবং এই 'মানি না' কথাটা সকলের কাছে মাথা উঁচু করে স্বীকার করতে হবে। এতে হয়তো লোকের অনেক নিন্দা-বদনাম-অপবাদ শুনতে হবে, কিন্তু আমি আমার কাছে ঠিক থাকব। তাঁদেরে বা তাঁদের মতো ঠিক না বুঝেও যদি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, আমি গান্ধি-ভক্ত বা রবীন্দ্র-ভক্ত বা অরবিন্দ-ভক্ত, তাতে অনেকের শ্রদ্ধা-প্রশংসা লাভ করব, কিন্তু আসলে তো সেটা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া। এতে অন্যকে প্রবঞ্চনা করে খুব বাহবা নিতে পারি, কিন্তু আমার অন্তরের দেবতা অর্থাৎ আমার আমি তো তাতে দিন দিন ক্লিষ্ট-পীড়িতই হয়ে উঠবে। অন্যায় করলে, পাপ করলে অন্তরে যে পীড়া উপস্থিত হয়, মানুষের সেইটুকুই সচেতন ভগবান, সেইটুকুই সত্য।

সকলেরই অন্তরে এমন একটা কিছু আছে, যেটা মিথ্যা সইতে পারে না। তা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। সেটাকে সব সময় হয়তো জিদের বশে স্বীকার করি না, কিন্তু নিজেকে তো আর ফাঁকি দেওয়া চলে না। যখন ফাঁকি দিয়ে লোকের কাছ থেকে বাহবা নিয়ে ঘরে ফিরি, তখন আমার ওই বাহবা অর্জনের ফাঁকির কথা মনে হয়ে প্রাণে যেন কেমন এক অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। ওই অসোয়াস্তিই হচ্ছে অনুশোচনা বা অনুতাপ। যাকে সদাসর্বদা তার কৃতকর্মের বা হঠকারিতার জন্য এই রকম অনুশোচনা বা অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হতে হয়, সে ক্রমেই ভীরু, কাপুরুষ হয়ে যেতে থাকে, সে তখন বাক-সর্বস্ব হয়ে ওঠে ফোঁপরা ঢেঁকির মতো। তার দিয়ে আর কোনোদিন কোনো বড়ো কিছুর আশা করা যায় না। আমাদের সকালের মধ্যে নিরন্তর এই ফাঁকির লীলা চলেছে। এই বাংলা হয়ে পড়েছে ফাঁকির বৃন্দাবন। কর্ম চাই সত্য, কিন্তু কর্মে নামবার বা নামাবার আগে এই শিক্ষাটুকু ছেলেদেরে, লোকেদেরে রীতিমতো দিতে হবে যে, তারা যেন নিজেকে ফাঁকি দিতে না শেখে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে নিজেকেই পীড়িত করে না তোলে।

আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন সে-সব ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভালো বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেইটুকু প্রকাশ করব, বলে বেড়াব, তাতে লোকে নিন্দা যতই করুক, আমি আমার কাছে আর ছোটো হয়ে থাকব না, আত্ম-প্রবঞ্চনা করে আর আত্মনির্যাতন ভোগ করব না।

যাঁকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তাঁকে বুঝবার ভান করলে তাঁকে অপমানই করা হয়। কারণ, পূজা মানে দেবতাকে সত্যি করে চিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। যাঁকে আমি সত্য করে বুঝতে পারিনি, তাঁকে পূজা করতে যাওয়া মানে তাঁর অপমান করা। মিথ্যা মন্ত্রের উচ্চারণে দেবতা পীড়িতই হয়ে ওঠেন দিন দিন, প্রসাদ দেন না।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্বলতা যে, এই শ্রদ্ধা-প্রশংসা পাওয়ার লোভটুকুকে কিছুতেই সে জয় করতে পারছে না। সমাজে থেকে সমাজের শ্রদ্ধা লাভের জন্য তাকে জেনে-শুনে অনেক মিথ্যা আচরণ করতে হয়। 'ধূমকেতু' এখন এইটুকু প্রচার করতে চায় যে, দেশ-উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হতে চায়, অন্তত তারা যেন সর্বাগ্রে এই দুর্বলতা, এই লোভটুকু জয় করবার ক্ষমতা অর্জন করে তবে কোনো কাজে নামে। সত্যিকার প্রাণ না নিয়ে কাজে নামলে তাতে কাজ পণ্ডই হয় বেশি।

অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধির অহিংস আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না, আপনি সরে পড়লেন। রবীন্দ্র-অরবিন্দ-ভক্তদের মধ্যেও ওই একই প্রবঞ্চনা-ফাঁকি এসে পড়েছে। এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়, বীর-ভক্ত নয়। এরা বুঝেও বোঝে না যে, পূজার নামে এরা তাঁদেরে অপমান করছে, বড়ো করবার নামে তাঁদেরে লোকচক্ষুতে আরও খাটোই করে তুলছে। এদের এতটুকু দুঃসাহস নেই যে, যেটুকু বুঝতে পারছে না সেটুকু 'বুঝতে পারছিনি' বলে বুঝে নিতে, পাছে তাঁর গুরুর কাছে সে কম বুদ্ধিমান হয়ে পড়ে বা গুরুর রোষদৃষ্টিতে পড়ে। এ-সব অন্ধলোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কেননা, অন্তরে মিথ্যা আর ফাঁকি নিয়ে কাজে নামলে কাজেও মস্ত ফাঁক পড়ে যায়। যাঁকে বুঝি না, যাঁর মত বুঝতে পারি না, তাঁর মুখের সামনে মাথা উঁচু করে বলতে হবে যে, আপনার মত বুঝতে পারছিনে বা আপনার এ-মত এই-এই কারণে ভুল। তাতে যিনি সত্যকার দেবতা, তিনি কখনই রুষ্ট হবেন না, বরং তোমার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তার দুঃসাহসিকতার জন্য শ্রদ্ধাই করবেন। বিদ্রোহ মানে কাউকে না-মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না, সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। যে-লোক তার নিজের কাজের জন্য নিজের কাছে লজ্জিত নয়, সে ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে স্বর্গের পথে উঠে চলবেই চলবে। আর যাকে পদে পদে তার ফাঁকি আর মিথ্যার জন্য কুণ্ঠিত হয়ে চলতে হয়, সে ক্রমেই নীচের দিকে নামতে থাকে, এইটাই নরক-যন্ত্রণা। আমার বিশ্বাস, আত্মার তৃপ্তিই স্বর্গসুখ। আর আত্মপ্রবঞ্চনার পীড়াই নরক-যন্ত্রণা। 'ধূমকেতু'র মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায়, তাই করো।

ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের মনের শাসন মেনে চলো। গান্ধির মত যদি প্রাণ থেকে না মানতে পার, বাস্, লোকের নিন্দা-বদনামের ভয়ে তা মেনো না, রবীন্দ্র-অরবিন্দের মত ঠিক মেনে নিতে পারছ না, বাস, মাথা উঁচু করে বলো, 'বুঝতে পারছি না'। অন্ধ-ভক্তির অন্ধতায় যা বোঝ

না তা, ‘বুঝি না’ বলো, দেখবে অপূর্ব তৃপ্তি-পুলকে আত্মা তোমার কানায় কানায় ভরে উঠছে। তখন নিন্দা-অপমান তোমার গায়ে লাগবে না। নিজে যতটুকু ভালো মনে কর, করো, তার চেয়ে মুক্তি আর নেই প্রাণের। ইংরেজের সহযোগিতা করে যদি দেশ উদ্ধার হবে তুমি প্রাণ হতে নিজকে ফাঁকি না দিয়ে বিশ্বাস কর, তবে তাই করো, কারুর নিন্দা ও অপবাদকে ভয় কোরো না। কিংবা যদি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে দেশের মুক্তি হবে না মনে কর, তাই বলো বুক ফুলিয়ে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বলো। তাতে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরাজের মার, তাতে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরও বেড়েই চলবে!

মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তাতে তোমার আসল নির্যাতন ওই অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হয়ে ওঠে, তখন নির্যাতকের আগুন ওই আনন্দের এক ফুঁতে নিবে যায়। ইব্রাহিম যখন বিদ্রোহী হয়ে নমরুদের অত্যাচারকে অত্যাচার আর তার মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন, তখন নমরুদ তাঁকে ধরে এক বিরাট অগ্নি-জাহান্নমের সৃষ্টি করে তাতে নিক্ষেপ করলে। কিন্তু ইব্রাহিমের কোথাও ফাঁকি ছিল না বলে, সত্যের জোর ছিল বলে তাঁর আত্মপ্রসাদ ওই বিপুল আনন্দের এক ফুঁতে সমস্ত জাহান্নম ফুল হয়ে হেসে উঠল। ইব্রাহিমের মনে যদি এতটুকু ফাঁকি থাকত, তবে তখনই নমরুদের আগুন তাঁকে ভস্মীভূত করে দিত।

ভগবানের বুকে লাথি মারবার অসমসাহসিকতা নিয়ে বেরিয়েছিলেন মহাবিদ্রোহী ভৃগু। কেননা সে তাঁকে বোঝেনি, তাঁর ভুলকে ভুল বলে শোধরাবার চেষ্টা করেছিল, ভগবান যখন তা শুনলেন না, ঘুমিয়ে রইলেন তখন ভৃগু ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগালে। ভগবানও ভৃগুর পদ-চিহ্ন সগৌরবে বক্ষে ধারণ করলেন। ভাবতে চক্ষে জল আসে। কিন্তু ভগবানের যারা বিদ্রোহী নয়, গো-বেচারি ভক্ত, ভগবানকে প্রভু ভেবে জনম-জনম কাটিয়ে দিলে সাধনায়, তাদেরে হয়তো সিদ্ধি তিনি দিলেন, কিন্তু তাদের কারুর পদাঘাতকে তো বুকে ধারণ করে দেখালেন না। এর আসল মানে হচ্ছে, সত্যকে জানবার যার বিপুল সত্য ইচ্ছা থাকে, তার আঘাতও সহ্য করে, বুকে করে নিয়ে তার সত্য-নিষ্ঠা, সত্য জাগাবার আকাঙ্ক্ষাকে জগতের ভীরু কাপুরুষ ভণ্ড-ভক্তদের চোখের সামনে দেখায় যে, এই ফাঁকির পূজারির ক্রন্দনে সত্য জাগে না। সত্যকে জাগাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শ্রদ্ধা-প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।

রুদ্র-মঙ্গল

নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মাকে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে আর চাবকাচ্ছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায়ের ক্রন্দন, 'বোধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙেছে –'। শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হুতাশ – শক্তি নাই, সাহস নাই।

কোথায় আঘাতের দেবতা! আঘাত করো, আঘাত করো তাদেরে, যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না! অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হয়ে অশ্রুজল নির্গত হয়, তাদের আঘাত করো, আঘাত করো হে আঘাতের দেবতা! মারো তাদের বুকে মুখে পিঠে – মারো তাদেরে। জাগাও তাদের আত্মসম্মান! পৌরুষ তাদের হুংকার দিয়ে পড়ুক অত্যাচারের বুকে।

এ কী বেদনা! এ কী ক্রন্দন! উৎপীড়িতের আর্তনাদে, 'মজলুমের ফরিয়াদে' আকাশের সারা গায়ে আজ জ্বালা, বাতাসের নিশ্বাসে ব্যথা, মাতা বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মধূম। অত্যাচারীর ভীম নিষ্পেষণে বাসুকির অচল ফণা থরথর করে কাঁপছে, এই ভূমিকম্পের কম্পিতা ধরণিকে অভয়-তরবারি এনে সান্ত্বনা দেবে, কে আছ বীর? আনো তোমার প্রলয়-সুন্দর করাল-কমনীয় হস্ত! আনো তোমার রক্ত-কৃপাণের বিদ্যুৎ-হাসি, আনো তোমার মারণ-মঙ্গল অভয়-অসি! হে আমার ধ্বংসের দেবতা, একবার এই মহাপ্রলয়ের বুকে তোমার ফুলের হাসি দেখাও! স্তূপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক! এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ করো, নাশ করো হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা! এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়-ভস্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও!

জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, হে আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতে এ-লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক – উলটে ফেলুক! আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো ওই উৎপীড়কের প্রাসাদ – ধূলায় লুটাও অর্থপিশাচ বল-দর্পীর শির। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধরো তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝান্ডা! যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আনো। সকল অহংকার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এসো ঝুঁটি ধরে ওই অর্থ-পিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমাদের পিতৃ-পুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ওই যক্ষের দেউল গড়া,

তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ওই লাবণ্য, ওই কান্তি। তোমাদের অভিশাপ-তিক্ত মারি-বিষ-জ্বালা লাগিয়ে তাদের সে-কান্তি, সে-লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও : বলো নির্জিত ভাইরা আমার, বলো উৎপীড়িত বোনেরা আমার, বলো বেদনাতুর অভাব-ক্লিষ্ট নর-নারী –

জয় ভৈরব জয় শংকর
জয় জয় প্রলয়ংকর
শংকর! শংকর!
মারো তোমার ত্রিশূল ছুঁড়ে, দুলাও তোমার সর্বনাশের ঝাণ্ডা, কে আছ ভৈরব-পন্থী নর-নারী আর হাঁকো – হাঁকো, –

জয় ভৈরব জয় শংকর!
জয় জয় প্রলয়ংকর!
শংকর ! শংকর!